মূলপাতা

পুঁজিবাদের ইসলামীকরণ

Asif Adnan

January 25, 2022

12 MIN READ

আধুনিক 'ইসলামী অর্থনীতি'র দার্শনিক ও জ্ঞানতাত্ত্বিক কাঠামো

অন্যান্য পশ্চিমা দর্শনের ইসলামীকরণের মতো ইসলামী অর্থনীতিরও মৌলিক সমস্যার শুরু হলো ইউরোপের এনলাইটেনমেন্টের দার্শনিক কাঠামোর ফসল হিসাবে বের হয়ে আসা সামাজিক বিজ্ঞানগুলো নিরপেক্ষ ও প্রতিক্রিয়াহীন (value-neutral) ধরে নিয়ে সেগুলোকে গ্রহণ করা।

আজকের বিজ্ঞ ইসলামী অর্থনীতিবিদরা এ সামাজিক বিজ্ঞানগুলোকে কেবল তাত্ত্বিক এবং নিরপেক্ষ (abstract & value neutral) মনে করেন। তারা মনে করেন, এগুলো থেকে বের হয়ে আসা পলিসিগুলো যেকোনো ব্যক্তি বা জীবনব্যবস্থার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সামাজিক বিজ্ঞানগুলোকে তারা কোনো যন্ত্র বা উপকরণের মতো করে দেখেন, যেগুলোকে ইচ্ছে অনুযায়ী যেকোনো কাজে লাগানো যায়। এ কারণেই পশ্চিমা শিক্ষা ও দর্শনের প্রতি তারা 'ভালোর গ্রহণ ও মন্দের বর্জন' এর নীতি অবলম্বন করেন।

কিন্তু বাস্তবতা হলো অর্থনীতিসহ অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানগুলো **নিরপেক্ষ (value neutral) না; বরং ইসলামী শিক্ষার মতো পশ্চিমা এ সামাজিক বিজ্ঞানগুলোরও আছে সুনির্দিষ্ট উৎস ও উদ্দেশ্য।**

সামাজিক বিজ্ঞানগুলো কাজ করে ব্যক্তির একটি নির্দিষ্ট সংজ্ঞাকে নিয়ে, যাকে Human Being বা 'ব্যক্তিমানব' বলা হয়ে থাকে। সামাজিক বিজ্ঞানগুলোর মতোই ব্যক্তির এই নির্দিষ্ট ধারণা এবং সংজ্ঞাও এনলাইটেনমেন্টের ফসল।

হিউম্যান বিয়িং এর এই ধারণা ব্যক্তিস্বাধীনতাকে স্বতঃসিদ্ধ সত্য হিসাবে ধরে নেয় (freedom as self-evident value)। হিউম্যান বিয়িং মানে কিন্তু নিছক 'মানুষ' না। সে এক নির্দিষ্ট চিন্তার, বিশেষ ধরনের মানুষ। সে হলো এমন কেউ যে নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও অমুখাপেক্ষী মনে করে। বিভিন্ন জীবনব্যবস্থা ও দর্শনকে সে মূল্যায়ন করে একটি ও কেবল একটি মাপকাঠি দিয়ে, মানবিক চাহিদা। মানবিক চাহিদা ও কামনা-বাসনার সীমাহীন পূর্ণতা, অর্থাৎ সীমাহীন অর্থনৈতিক উন্নতিই এই হিউম্যান বিয়িং-এর জীবনের উদ্দেশ্য।

অর্থনীতিশাস্ত্রের (Economics) পুরো কাঠামো গড়ে উঠেছে ব্যক্তির এই নির্দিষ্ট সংজ্ঞা এবং এর অন্তর্নিহিত মূলনীতিগুলোর ওপর ভিত্তি করে। অর্থনীতির সব বিশ্লেষণ ও তত্ত্ব এমন একজন ব্যক্তি বা একোনমিক এজেন্টকে ঘিরে তৈরি করা যে,

> ১) কেবল তার ব্যক্তিস্বার্থের প্রতি নিবেদিত
>
> ২) যে বিশ্বাস করে, সর্বোচ্চ স্বার্থ অর্জিত হয় সর্বোচ্চ ব্যক্তিস্বাধীনতার মাধ্যমে [1]। অর্থাৎ আমার জন্য কোনটা ঠিক সেটা আমিই ঠিক করব। ব্যক্তির স্বার্থনির্ভর করে ইচ্ছেমতো যেকোনো কিছু করার সক্ষমতা ও স্বাধীনতার ওপর।
>
> ৩) অন্য কারও ঠিক করে দেয়া ভালোমন্দের মাপকাঠি গ্রহণ বা বর্জনে ব্যক্তি বাধ্য না। কোনো উচ্চতর শক্তির ঠিক করে দেয়া নৈতিকতা মেনে চলা ব্যক্তিমানবের (Human Being) দায়িত্ব না[2]। কান্টের ভাষায়, ব্যক্তি স্বাধীন, স্বশাসিত (autonomous)[3]। তার জীবনে কী করা উচিত, এ প্রশ্নের জবাব দেয়ার অধিকার শুধুই তার নিজের। অন্য কোনো কর্তৃপক্ষের এ প্রশ্নের জবাব দেয়ার অধিকার আছে বলে স্বাধীন ব্যক্তি স্বীকার করে না। [4]
>
> ৪) কোনো নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে কী বেছে নেয়া হচ্ছে তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হলো তার 'যেকোনো কিছু বেছে নেয়ার স্বাধীনতা ও

> সক্ষমতা’ থাকা।
>
> ৫) যেহেতু স্বাধীনতার বস্তুগত প্রকাশ (material manifestation) ঘটে পুঁজির মাধ্যমে, তাই নিজের ইচ্ছা ও পছন্দ অনুযায়ী যেকোনো কিছু বেছে নেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় টাকা থাকাটাই দিনশেষে ব্যক্তিমানবের (Human Being) কাছে মুখ্য। আর সে কী পছন্দ করবে, কোনটা বেছে নেবে তা একান্তই তার ব্যক্তিগত ব্যাপার। আর কারও অধিকার নেই এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার।

সবগুলো সামাজিক বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হলো এই নির্দিষ্ট চিন্তার হিউম্যান বিয়িংয়ের জন্য উপযুক্ত বাজার, সমাজ, শক্তি ও সরকার গড়ে তোলা।

যেমন অর্থনীতির উদ্দেশ্য হলো অর্থনৈতিকভাবে ব্যক্তির উন্নতির ক্ষেত্র ও সুযোগগুলো সহজ করার জন্য উপযুক্ত পুঁজিবাদী ব্যবস্থা, কাঠামো সমাজ ও নেতৃত্ব প্রস্তুত করা।

উদাহরণ দিলে ব্যাপারটি বুঝতে সুবিধা হবে। দেখুন, ইসলামী জ্ঞানের শাখাগুলোর মধ্যে ফিকহশাস্ত্রের উদ্দেশ্য হলো, কুরআন-সুন্নাহতে বর্ণিত নুসুস থেকে মূলনীতি গ্রহণ করার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য মানবিক কর্মকাণ্ডের সঠিক পদ্ধতি সম্পর্কেজানা। কুরআন-সুন্নাহর ওপর ভিত্তি করে প্রতিটি কাজের শরয়ী হুকুম বর্ণনা করা।

ফিকহের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি, কীভাবে আমাদের লাইফ-স্টাইলকে আল্লাহ্‌র দেয়া বিধানের অনুগামী করা যায়।

তেমনিভাবে তাযকিয়্যাহর উদ্দেশ্য হলো শার’ঈভাবে বৈধ ও উপযুক্ত কর্মপদ্ধতির মাধ্যমে ব্যক্তির নাফসকে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উপযুক্ত করে তোলা।

ঠিক একই ভাবে পশ্চিমা সামাজিক বিজ্ঞানগুলোরও নির্দিষ্ট উৎস ও উদ্দেশ্য আছে।

সামাজিক বিজ্ঞানগুলোর উদ্দেশ্য হলো একদিকে পুঁজিবাদী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, লাইফ-স্টাইল ও রাষ্ট্রের দার্শনিক কাঠামো তৈরি করা।

অন্যদিকে এমন নীতিমালা তৈরি করা, যা ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত বিষয়ের ক্ষেত্রে স্বাধীনতার এমন সীমারেখা ঠিক করে দেবে, যার ওপর ভিত্তি করে পুঁজিবাদী জীবনব্যবস্থা, সমাজ ও রাষ্ট্রকে নিয়মতান্ত্রিক ও সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনা করা যাবে।

কাজেই পশ্চিমা সামাজিক বিজ্ঞানগুলোর লক্ষ্য হলো এমন এক সংবিধান ও সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা, যার সাথে আল্লাহর নাযিল করা বিধানের কোনো সম্পর্কথাকবে না।

এনলাইটেনমেন্টের ফসল হিউম্যান বিয়িং এর ধারণার ওপর ভিত্তি করেই সামাজিক বিজ্ঞানগুলোর সব আলোচনা আবর্তিত হয়।

লক্ষণীয় আরেকটি বিষয় হলো প্রত্যেক সামাজিক আচার ও জীবন প্রক্রিয়াকে পরিচালনার জন্য নির্দিষ্ট পলিসি এবং সেই পলিসি বাস্তবায়নের জন্য উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান দরকার। এই পলিসিগুলো তৈরি হয় নির্দিষ্ট কিছু বিশ্বাস ও দর্শনের ওপর ভিত্তি করে। কোনো নির্দিষ্ট ধরনের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, লাইফ-স্টাইল ও রাষ্ট্রের বাস্তবায়নের জন্য। বিভিন্ন জীবনব্যবস্থার অন্তর্নিহিত মূল্যবোধ, দর্শন ও উদ্দেশ্যের মধ্যে পার্থক্য থাকার কারণে সব পলিসি সব জীবনব্যবস্থায় ব্যবহার করা যায় না।

যেমন : অবাধ স্বাধীনতা আর ভোগবাদী মানসিকতাকে ধ্রুব সত্য ও মূলনীতি হিসাবে ধরে নিয়ে যে জীবনব্যবস্থা তৈরি হয়, সেখানে মদ্যপান, যৌনতা, সুদি ঋণের ব্যাপক প্রচলন, মহিলাদের চাকরিতে উদ্বুদ্ধ করাসহ বিভিন্ন পলিসি থাকবেই। আবার অন্যদিকে এই পলিসিগুলোই ইসলামী মূল্যবোধ ও জীবনব্যবস্থার জন্য হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

জীবনকে সফলভাবে পরিচালনার জন্য একজন পুঁজিবাদী মার্কেটিং প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করে তোলার পলিসি গ্রহণ করবে। আবার একজন সোশ্যালিস্ট (socialist) সে এই মার্কেটিং প্রতিষ্ঠানগুলোর বিলুপ্তি চাইবে।

দুজনের উদ্দেশ্য এক কিন্তু মতবিরোধ সেই উদ্দেশ্য অর্জনের পন্থা নিয়ে। সুতরাং পলিসি ও উদ্দেশ্যের সম্পর্কস্পষ্ট।

যদি আপনাকে কেউ পলিসি বানাতে বলে, তাহলে আপনি প্রথমে জানতে চাইবেন যে কোন উদ্দেশ্যে আপনি পলিসি বানাবেন? পলিসিকে ডাক্তারের প্রেসক্রিপশানের সাথে তুলনা করতে পারেন।

এক রোগীর প্রেসক্রিপশান আরেক রোগীর জন্য ব্যবহারযোগ্য না। একই ভাবে যেকোনো উদ্দেশ্য যেকোনো পলিসি দিয়ে অর্জন করা যাবে না।

উদ্দেশ্যের এ সম্পর্কশুধু পলিসির সাথেই না; বরং সমাজে নির্দিষ্ট কোনো শ্রেণির কর্তৃত্বশীল প্রাতিষ্ঠানিক অবস্থার সাথেও সম্পৃক্ত।

একজন উদারনৈতিক পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা চায়, কিন্তু শ্রমিকরা একনায়কতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক রাস্ট্রব্যবস্থার স্বপ্ন দেখে।

সুতরাং এসব সামাজিক বিজ্ঞান বা দর্শন থেকে নেয়া পলিসিগুলো ওতপ্রোতভাবে পুঁজিবাদের সাথে জড়িত। এগুলোর মাধ্যমে কখনোই ইসলামী জীবনব্যবস্থার অগ্রগতি হবে না; বরং এতে পুঁজিবাদী আদর্শের উন্নতি ও প্রসার ঘটবে। সামাজিক বিজ্ঞানগুলো হলো পুঁজিবাদী ব্যবস্থার জ্ঞানতাত্ত্বিক ও দার্শনিক কাঠামোর অংশ। অন্য ভাষায় অর্থনীতিসহ অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানগুলো পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অংশ, এবং এগুলোর কাজ হলো পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অনুসরণ ও বাস্তবায়ন।

অর্থনীতিশাস্ত্র

এবার আমরা অর্থনীতিশাস্ত্র বা Economics নিয়ে কিছুটা আলোচনা করব। এ আলোচনার জন্য অর্থনীতিশাস্ত্রের সাথে জড়িত কিছু চিন্তাধারা বা ঘরানার সাথে পরিচিত হওয়া জরুরি। এই চিন্তাধারাগুলোকে বর্তমান অর্থনীতিশাস্ত্রের আদর্শিক কেন্দ্রবিন্দু বলা যায়। এর মধ্যে তিনটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :

১) নিওক্ল্যাসিকাল অর্থনীতি ও বাজার অর্থনীতি, যা পুঁজিবাদী ব্যক্তিবাদকে (individualism) উৎসাহিত করে।

২) সমাজতন্ত্র ও মার্ক্সবাদ। যা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার কালেক্টিভিস্ট ব্যাখ্যা দেয়।

৩) গণতন্ত্র, যা ওপরের দুই ব্যবস্থার ত্রুটিগুলো দূর করে ভালো দিকগুলোর মিশ্রণ ঘটিয়ে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার আরও উন্নত একটি রূপরেখা গঠনের চেষ্টা করে। এটাকে Mixed Economy বা মিশ্র অর্থনীতি বলা হয়।

এই মতবাদগুলোর মাঝে বেশ কিছু আদর্শিক ভিন্নতা আছে। তবে মনে রাখতে হবে, কিছু আদর্শিক পার্থক্য থাকলেও এই মতবাদগুলোর মধ্যে উদ্দেশ্যের দিক থেকে মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই। পার্থক্য কর্মপদ্ধতিতে। কারও কাছে গন্তব্যে পৌঁছানোর উপায় হলো বাজার অর্থনীতি, আবার কারও কাছে সেটা হলো পরিকল্পনা (Planning)।

সোশ্যাল ডেমোক্রেসি মৌলিকভাবে এই দুই ব্যবস্থা থেকে আলাদা কিছু না; বরং সোশ্যাল ডেমোক্রেসি অবাধ স্বাধীনতা, সমতা ও ভোগের উন্নতির জন্য এ দুই ব্যবস্থার ভালো দিকগুলো একত্র করতে চায়।

বিষয়টি বোঝার জন্য আপনি বিভিন্ন ফিকহী মাযহাবগুলোর কথা চিন্তা করতে পারেন। হানাফি, মালিকি, শাফে'ঈ, হাম্বলি—সবগুলো মাযহাবের উদ্দেশ্য এক—শরীয়াহ প্রণেতার সন্তুষ্টি অর্জনের সঠিক পথ অবলম্বন **করা। কিন্তু মাযহাবগুলোর ভেতরে শাখাগত বিষয়ে অনেক পার্থক্য আছে। অর্থনীতিশাস্ত্রের এ চিন্তাধারাগুলোর ব্যাপারটাও অনেকটা এ রকম।**

বর্তমানে ইসলামী অর্থনীতি বা ইসলামী ফাইন্যান্স বলতে আমরা যা দেখি, সেটা মূলত নিও-ক্লাসিকাল অর্থনীতির ভিন্ন একটি রূপমাত্র। এটি স্বতন্ত্র কোনো চিন্তাধারা না, এবং এর নিজস্ব কোনো আদর্শিক কেন্দ্রবিন্দু নেই। ইসলামী অর্থনীতি নিও-ক্ল্যাসিকাল অর্থনীতির সমস্ত মূলনীতি ও মৌলিক চেতনাকে 'প্রাকৃতিক বাস্তবতা' হিসাবে মেনে কেবল এর ওপর কিছু বিধি-নিষেধ[5] আরোপ করে। কিন্তু নিও-ক্ল্যাসিকাল অর্থনীতির আলোচনা পুঁজিবাদী ব্যক্তিসত্তা বা হিউম্যান বিয়িং-কে নিয়ে। আর যেমন আমরা বলেছি, এ চিন্তাধারা একটি নির্দিষ্ট ধরনের মানুষ, নির্দিষ্ট ধরনের ব্যক্তিসত্তার কথা বলে। অর্থনীতিশাস্ত্র বা Economics এই ব্যক্তিসত্তা এবং তার চাহিদা ও কাজের ব্যাপারে নির্দিষ্ট কিছু মূলনীতি গ্রহণ করে। যেমন :

> ১) মানুষ স্বাধীন, তার চাহিদা সীমাহীন। জীবনের উদ্দেশ্য হলো কেবল ইচ্ছামতো কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার অধিকারের পূর্ণতা অর্জন।
>
> ২) কামনা-বাসনার প্রাধান্যের মাপকাঠি হলো নফস। ইচ্ছা অনুযায়ী নিজের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়ন করতে পারা মানুষের অধিকার। আর নিজের কল্যাণের ব্যাপারে শ্রেষ্ঠ বিচারক হলো ব্যক্তি নিজেই।
>
> ৩) মানুষের সব কাজের একমাত্র উদ্দেশ্য, সম্ভাব্য সর্বোচ্চ পরিমাণ উপযোগ অর্জন করা (utility maximization)। ভোগবাদী মানসিকতার ওপর প্রতিষ্ঠিত অর্থনীতিশাস্ত্র অনুযায়ী প্রতিটি মানুষ একজন ভোক্তা, যার সব কাজের উদ্দেশ্য অধিক উপযোগ অর্জন। কিন্তু সব চাহিদা পূরণের উপকরণ তার কাছে না থাকার কারণে ভোক্তার উচিত উপযোগ অর্জনের জন্য যত বেশি সম্ভব উপকরণ উপার্জনের চেষ্টা করা।
>
> ৪) উৎপাদনের উদ্দেশ্য হতে হবে লাভের সর্বোচ্চকরণ (maximizing profit) এবং পুঁজি পুঞ্জীভূত [6] করা। উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য অর্থনৈতিক কার্যক্রমকে প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে পরিচালনা করা জরুরি। আর অর্থনীতির প্রত্যেক সদস্যের উচিত, তার সমস্ত মেধা ও দক্ষতা পুঁজি বৃদ্ধির পেছনে ব্যয় করা।
>
> ৫) সব ধরনের লেনদেন, আদান-প্রদান ও কর্মকাণ্ডের ভিত্তি কেবল স্বার্থ। স্বীয় উদ্দেশ্য অর্জনই মুখ্য।

এসব বিষয়কে সহজাত বা ফিতরাতি (natural disposition) হিসাবে মেনে নেয়ার পর অর্থনীতিশাস্ত্র নিচের দুটি প্রশ্নের উত্তর দেয়ার চেষ্টা করে :

এক. কোন ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ও বোঝাপড়ার মাধ্যমে প্রত্যেক সদস্যের অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভব হবে, এবং বিনিয়োগের মাধ্যমে আরও বেশি কর্মসংস্থান তৈরি করা যাবে?

দুই. এসব প্রতিষ্ঠানের সাথে রাষ্ট্রের সম্পর্ককেমন হবে? অর্থাৎ কোন ধরনের রাষ্ট্রীয় নীতি অনুসরণ করলে পুঁজি বৃদ্ধিতে গতি আসবে? পুঁজিবাদী ব্যবস্থার উন্নতির জন্য প্রতিষ্ঠানগুলোর মাঝে কোন ধরনের কর্মসূচির প্রচলন করা দরকার? ইত্যাদি।

নিও-ক্ল্যাসিকাল অর্থনীতিবিদদের কাছে মার্কেট বা বাজার হলো এমন একটি প্রতিষ্ঠান, যা পুঁজি বৃদ্ধির কাঠামো তৈরি করে। অর্থাৎ উৎপাদনের সব মাধ্যম ও উপাদান যদি বাজারের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে, তাহলে পুঁজির বৃদ্ধির হার সর্বোচ্চ হবে। মার্কেট হচ্ছে সেই কাঠামো, যেখানে অর্থনীতির প্রত্যেক সদস্য নিজ নিজ স্বার্থের ভিত্তিতে একে অপরের সাথে পারস্পরিক সম্পর্কগড়ে তোলে। আর এখানে পণ্য ও সেবার মান নির্ধারিত হয় সামগ্রিক উপযোগ (aggregate utility) এবং অর্থনীতির উন্নতির ভিত্তিতে।

এ জন্যই একজন ব্যাংকারের বেতন মসজিদের ইমামের চেয়ে কয়েক লক্ষ টাকা বেশি হয়। কারণ, অর্থনীতির উন্নতিতে ইমামের চেয়ে ব্যাংকারের ভূমিকা অনেক গুণ বেশি। একজন কুরআন শিক্ষকের সম্মানির চেয়ে ডাক্তারের ফি বেশি হয়। এমনকি ব্যাংকের শরয়ী বিভাগের প্রধানের বেতনও মাদরাসা শিক্ষকের বেতনের চেয়ে বেশি হয়। কারণ, মাদ্রাসা

শিক্ষকের যোগ্যতা অর্থনীতিতে তেমন কোনো উন্নতি আনে না।

মোটকথা, মার্কেট যে ভিত্তিতে মান নির্ধারণ করবে সেটাই মূলনীতি। এর বাইরে মূল্যায়নের আর কোনো মাপকাঠি অর্থনীতিশাস্ত্রে নেই। চাহিদা ও জোগানের (supply & demand) নীতি অর্থনীতির উন্নতিরই মাধ্যম। এ নীতির পেছনে যে চিন্তাধারা কাজ করে সেটা সমাজে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও প্রতিযোগিতাকেন্দ্রিক চিন্তাধারা তৈরি করে। অর্থাৎ মার্কেট মূলত এমন এক মানসিকতার জন্ম দেয়, যার ভিত্তি হলো লোভ ও হিংসা। সংক্ষিপ্তভাবে বলা যায়, অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে মার্কেট হলো এমন এক প্রতিষ্ঠান যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ চাহিদা পূরণের সুযোগ পায়।

এ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও বোঝাপড়ার মধ্যে রাষ্ট্র নিজে কোনো অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে না। রাষ্ট্রের কাজ হলো অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড যেন লাভজনক হয় তা নিশ্চিত করার জন্য সামগ্রিক রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করা। যাকে 'নাইট ওয়াচম্যান স্টেইট' (Night Watchman State) বলা হয়।

এ ব্যবস্থায় সরকারের কাজ হলো এমন পলিসি তৈরি করা, যা প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত পুঁজি বাড়ানোর এই কাঠামোকে এর সদস্যদের পারস্পরিক প্রতিযোগিতার দরুন বিশৃঙ্খলার শিকার হওয়া থেকে রক্ষা করবে।

লেনদেন ও নেতৃত্বের যে কাঠামো ও কর্মপদ্ধতি নিও ক্ল্যাসিকাল অর্থনীতি দেয় সেটা কখনোই নিরপেক্ষ (value neutral) কিংবা প্রতিক্রিয়াহীন না; বরং এই পুরো কাঠামো পুঁজিবাদের লক্ষ্য বাস্তবায়ন ও পুঁজিবাদী মানসিকতা তৈরির মাধ্যম। এটা হতেই পারে না যে, সমাজে মার্কেটের প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি পাবে আর সমাজের সদস্যদের মাঝে ভোগবাদী মানসিকতা, প্রতিযোগিতা ও ঈর্ষার মনোভাব বৃদ্ধি পাবে না। মনে রাখতে হবে, মার্কেট কোনো নির্দিষ্ট জায়গার নাম না, যেমনটা অনেকেই মনে করেন। মার্কেট হলো এমন প্রতিটি সম্পর্কযার ভিত্তিতে পণ্য ও সেবার বিনিময়ে অর্থের লেনদেন হয়। বর্তমান যুগের শিল্প প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল ইত্যাদি, এ অর্থেই মার্কেট। মার্কেট কোনো প্রতিষ্ঠান কিংবা প্রাতিষ্ঠানিক কাজের নাম না। সব সামাজিক লেনদেন মার্কেটের অন্তর্ভুক্ত। এমনকি পরিবারকেও মার্কেট নিজ পরিধির মাঝে নিয়ে আসে। যার দৃষ্টান্ত আমরা পাশ্চাত্যে দেখতে পাই। এ জন্যই বলা হয়—Market is a totalizer.[7]

আফসোসের ব্যাপার হলো মার্কেট বা বাজার অর্থনীতি আজ মাদ্রাসার ভেতরেও ঢুকে গেছে। যার প্রকাশ ঘটছে টাকার বিনিময়ে ফতোয়া দেয়ার মাধ্যমে। নিজেদের ১৪ শ বছরের সোনালি ইতিহাসের ওপর কালিমা ছুড়ে দিয়ে অর্থের বিনিময়ে ফতোয়া দেয়াকে আজ খুব সুন্দর নামে আখ্যায়িত করা হচ্ছে।

[ড. যাহিদ মুঘল এর 'ইসলামী ব্যাংকারি: গালাদ সুওয়াল কা গালাদা জাওয়াব' বই থেকে নেয়া। বাংলায় **'ইসলামী ব্যাংক: ভুল প্রশ্নের ভুল উত্তর'** নামে অনূদিত। অনুবাদ, ইফতেখার সিফাত]

* * *

[1] ব্যক্তিস্বার্থ ও ব্যক্তিস্বাধীনতার এ সম্পর্কেনিয়ে সাম্প্রতিককালে অমর্ত্য সেন বিস্তারিত আলোচনা এনেছেন। *Rationality & Freedom*, Sen (2000); *Developement As Freedom*, Sen (1999)

[2] কান্টের মতে নিজের ইচ্ছেমতো ভালোমন্দ নির্ধারণের এ ক্ষমতাই ব্যক্তির এনলাইটেনমেন্টের (আলোকিত হওয়া, জ্ঞানপ্রাপ্ত হওয়ার) বৈশিষ্ট্য। দেখুন *Answering the Question: What is Enlightenment?* Kant (1784)

[3] Kant (1৭64), ব্যক্তির স্বাধীনতা ও স্বশাসনের তুলনামূলক সহজ বর্ণনার জন্য দেখুন *Ethical Theory and Moral Problems*, Curzer (1999)

[4] ওয়েলফেয়ার একোনমিক্সে একে 'Pareto principle of individual liberty' বলা হয়। যার অর্থ হলো নিজ কল্যাণের প্রশ্নে শ্রেষ্ঠ বিচারক ব্যক্তি নিজেই।

[5] (restraints/regulations)

[6] Accumulation of Capital

[7] “In fact, the whole world may be looked upon as a vast general market made up of diverse special markets where social wealth is bought and sold. Our task then is to discover the laws to which these purchases and sales tend to conform automatically.” [Walras (1874), *Elements of Pure Economics*: p.84]